Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম নাকি শরীয়াহ উত্তম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আদিবা আফরিন নাঈমা

রোলঃ 227022258

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম নাকি শরীয়াহ উত্তম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোলঃ ------

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সেকুলারিজম নাকি শরীয়াহ উত্তম ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আদিবা আফরিন নাঈমা, আইডিঃ 227022258 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সেকুলারিজম নাকি শরীয়াহ উত্তম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আদিবা আফরিন নাঈমা

আইডিঃ 227022258

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সেকুলারিজম কী ও এর উৎপত্তি 6

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের ব্যাখ্যা 7

ব্যবহারিক সেক্যুলারিজম 10

শরীয়াহ ই মানবজীবনের জন্য উত্তম জীবনব্যবস্থা: 20

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার,আমরা তারই প্রশংসা করি। তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاۙ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল।—আল আহ্যাব - ৭০।

সর্বোত্তম কিতাব আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত মুহাম্মাদ ﷺ এর হিদায়াত। দীনের মাঝে নব-উদ্ভাবিত সকল বিষয় নিকৃষ্ট।নব-উদ্ভাবিত সকল জিনিস বিদআহ,আর প্রতিটি বিদআহ পথভ্রষ্টতা।

ফিতনার পরিমাণ ও পরিধি বর্তমানে ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে।সাম্প্রতিক সময়ে উম্মাহর মাঝে হানা দেওয়া একটি বিদআহ হল আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ত্যাগ করে ভিন্ন কিছু দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা।বিচার-ফায়সালার জন্য আল্লাহর শরীয়াহ বাদ দিয়ে ভিন্ন কিছুর শরণাপন্ন হওয়াও এর অংশ। এটিই এখন অধিকাংশ মুসলিম দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তাদের সংবিধানের ভিত্তি।অথচ শরীয়াহ দিয়ে শাসন করা ইসলামী আক্বিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ।এটি নানাভাবে আকীদাহর সাথে সংযুক্ত।শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন এবং সব ক্ষেত্রে শরীয়াহর বিধান মোতাবেক বিচার ফায়সালা করা বাধ্যতামূলক এবং উত্তম–এটি মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।স্পষ্টভাবে মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে মুসলিমদের জন্য শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই।আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য জাহিলি জীবনব্যবস্থা,মতবাদ,আইন কানুন ও মানব রচিত সংবিধানের মাধ্যমে বিচার-ফায়সালা করার বিপদ তুলে ধরতে হবে। আশা করি সত্য তুলে ধরার সেই প্রচেষ্টায় এ লেখাটি একটি ক্ষুদ্র খিদমাত হিসেবে সংযুক্ত হবে।আল্লাহর কাছে দুয়া করি, যেন তিনি আমাকে ইখলাস ক নিয়াতের বিশুদ্ধতার দান করেন এবং এই কাজকে সকলের জন্য কল্যাণকর হিসেবে কবুল করেন।

সেকুলারিজম কী ও এর উৎপত্তি

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (ইংরেজি: Secularism) বলতে বোঝায় পার্থিব,ইহজগতিক, ধর্মহীনতা। রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করা । কিছু নির্দিষ্ট প্রথা বা প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। এক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে।ধর্মনিরপেক্ষ বলতে মূলত বোঝানো হয়ে থাকে যে রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না। ধর্মনরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে যাতে বলা হয় মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো, বিশেষত রাজনীতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার”।ধর্মনিরপেক্ষ বলতে মূলত বোঝানো হয়ে থাকে যে রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না।ধর্মের দিক দিয়ে গণতন্ত্র’, ‘সমাজতন্ত্র’ ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক। তবে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 'ধর্মীয় সমন্বয়বাদ' আর সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'ধর্মহীনতা' I

রাজনৈতিক ব্যবহারের দিক থেকে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে সাধারণ আইনজারি এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজম অর্থে উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যবহার করা হয় না। উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলিত ধারণা হল, নাগরিকদের ধর্ম থাকবে তবে রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের ব্যাখ্যা

" নিরপেক্ষ" শব্দের অর্থ কোনও পক্ষে নয় । "ধর্ম-নিরপেক্ষ" শব্দের অর্থ, কোন ধর্মের পক্ষে নয় । অর্থাৎ সমস্তর ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন । "Secularism" শব্দের আভিধানিক অর্থ - একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত । আর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- Rejects all forms of religious faith অর্থাৎ এটি হলো এমন দর্শন যা সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়। Encyclopedia of Britanica তে বলা হয়েছে যে, যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং আধ্যাত্মিকতা, জবাবদিহিতা ও পবিত্রতা বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। chambers dictionary -এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে- The belief that the state morals, education should be independent of religion. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো এমন এক বিশ্বাস যার মতে, রাষ্ট্র, নৈতিক, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু ধর্মমুক্ত থাকবে। Oxford dictonary -এর মতে, আল্লাহতে বিশ্বাস বা পরকালে বিশ্বাসনির্ভর ত্যাগ করে মানব জাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

"ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম" শব্দটি ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ লেখক জর্জ জ্যাকব ইলিয়ক (১৮১৭-১৯০৪) প্রথম ব্যবহার করেন। জর্জ জ্যাকব ধর্মের কোনো রকম সমালোচনা ছাড়া, সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য তার এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি এই মতবাদকে আরো বিস্তৃত করেন এবং বলেন যে "ধর্মনিরপেক্ষতা খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধের কেনো মতবাদ নয়। এটি একটি স্বাধীন সত্ত্বা। ধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে এটি কোনো প্রশ্ন তোলে না, কিন্তু অন্যদের ধর্মনিরপেক্ষ হতে উৎসাহিত করে।"
বেরি কসমিন যিনি ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আরো গবেষণা করেন তিনি এটিকে দুইটি অংশে বিভক্ত করেন। ১। কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতা ২। নমনীয় ধর্মনিরপেক্ষতা।

ফ্রান্সে laïcité আন্দোলন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ ধর্মনিরপেক্ষতার আধুনিক ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করেছে।আমরা এখন যে অর্থে সেক্যুলারিজমকে বিবেচনা করি তা তৈরি হয়েছে তিনটি স্বতন্ত্র রূপান্তরের মাধ্যমে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে সেক্যুলারিজম শব্দটির উৎপত্তি সেক্যুলাম থেকে, যা সময় পরিমাপের একটি একক। রোমানরা এটাকে এক প্রজন্মের সমমান এবং সাধারণ জীবনচক্র হিসেবে ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে এর প্রমিতকরণ হয় এবং এটি এক শতাব্দী হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই অর্থের প্রথম রূপান্তর ঘটে ত্রয়োদশ

শতাব্দীতে, যখন খ্রিষ্টধর্মের যাজকদের কাজের মধ্যে দুটি আলাদা ধারা দেখা গেল। এই বিভক্তি ঘটে 'পারলৌকিক' এবং 'ইহজাগতিক'র মধ্যে: 'যেসব যাজক নিজেদের ইহজাগতিক বিষয় (সেক্যুলাম) থেকে প্রত্যাহার করে নেয়, তারা জন্ম দেয় ধর্মীয় যাজকমণ্ডলীর; আর যারা ইহজাগতিক বিষয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখে, তারা জন্ম দেয় সেক্যুলার যাজকমণ্ডলীর'। প্রথমোক্তরা নিজেদের কেবল ধর্মীয় বৃত্তিতে নিয়োজিত করেন এবং শেষোক্তরা সেক্যুলার বৃত্তিগুলোতে জড়িয়ে পড়েন। এই বিভেদ অগাস্টিনের 'দেবতার শহর' এবং 'মানুষের শহর' পার্থক্যের ভিত্তি গড়ে দেয়। দ্বিতীয় রূপান্তর ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে, যখন শব্দটির সঙ্গে ঈশ্বরহীনতার বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়; ফলে সেক্যুলারকৃত বলতে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে গির্জার মালিকানা থেকে পার্থিব মালিকানায় হস্তান্তর বা অন্যার্থে গির্জা-সম্পৃক্ততা থেকে নাগরিক-সম্পৃক্ততায় রূপান্তর বোঝানো হতো। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলো যা 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধ' (১৬১৮-১৬৪৮) বলে পরিচিত তার অবসানের পরে এই অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। এ কথা বলা যায় যে, 'পিস অব ওয়েস্টফেলিয়া' (১৬৪৮) সেক্যুলারিজমের এই অর্থকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। কিন্তু ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তিগুলোর দুটি উপাদান ছিল: একটি হচ্ছে এই নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা যে ধর্মের প্রসঙ্গ না টেনেই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিবাদগুলো সমাধান করা হবে; অপরটি হচ্ছে এটা মেনে নেওয়ায় যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 'কিয়ুস রেজিও, ইয়ুস রিলিজিও' অর্থাত্‌ যার রাজত্ব, তার ধর্ম। যার অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে ধর্মকে বিদায় দেওয়া হলেও, ধর্মের ওপর ভিত্তি করে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে তা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি; অন্য অর্থে 'এটি ধর্মভিত্তিক (কনফেশনাল) রাষ্ট্রের বৈধতা দান করেছিল'। তৃতীয় রূপান্তরটি ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যখন হোলিওক সেক্যুলারিজম শব্দটির প্রচলন করেন। পরবর্তী সময়ে এটি ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্কের পৃথক্করণের আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। এরপরের শতাব্দীতে সেক্যুলারিজমকে প্রগতি ও উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

সেক্যুলারিজম ধারণাটি সর্বপ্রথম কে এনেছিলেন এই নিয়ে অসংখ্য মত আছে। কেউ কেউ বলেছেন ফেরাউন (রেমেসিস ২) নিজেই একটি স্রষ্টাবিহীন সেক্যুলার সোসাইটি গঠন করেছিল খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগে। কেউ কেউ বলেন, সক্রেটিস এবং তাঁর সময়কার গ্রিক দার্শনিকগণ, যারা দেব-দেবী এবং অন্যান্য ধারণার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তারা সেক্যুলারিজমের ধারণা এনেছেন। তবে সন্দেহ নেই সেক্যুলারিজম ধারণাটি এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডে এসে জনপ্রিয় হয়।

এনলাইটেনমেন্ট থিংকারদের মধ্যে জন লক, ভলটেয়ার, জেমস ম্যাডিসন, টমাস জেফারসন এরা সেক্যুলারিজম ধারণায় বেশ ভালো কন্ট্রিবিউট করেছেন। ধারণাটি পুরনো হলেও ংবপঁষধৎরংস শব্দটি প্রথম নিয়ে আসেন জর্জ জ্যাকব হলিওক। ইউরোপের

এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডে যখন চার্চের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন শুরু হয়, তখনি এই মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অবশ্য চার্চের সীমাহীন দুর্নীতি ও অনাচার এই মতবাদ বিস্তারের জ্বালানি যোগান দিয়েছিলো- এই কথা বলা ভুল হবেনা। আর তাই 'separate state from church' আন্দোলনই একটা সময়ে সেক্যুলারিজমের রূপ ধারণ করে। লক্ষ্যনীয় যে, এই আন্দোলনকারীরাও কিন্তু একটা 'পক্ষ'। এই পক্ষ আন্দোলন করেছিলো চার্চের বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে ছিলো ক্যাথলিকরা, যারা চেয়েছিলো রাষ্ট্রক্ষমতা চার্চের হাতে থাকুক। তাহলে 'separate state from church' আন্দোলনকারী 'পক্ষ' কী করে নিজেদেরকে 'নিরপেক্ষ' দাবী করতে পারে? উত্তর হচ্ছে, পারে না এবং করেও না। আপনি পাশ্চাত্যে কাউকে দেখবেন না সেক্যুলারিজমকে 'নিরপেক্ষ' বলে দাবী করতে। কারণ, এটা স্পষ্টতই একটা পক্ষ। একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকারী পক্ষ, যারা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে হটাতে চেয়েছিলো। পরবর্তীতে এই সেক্যুলারিজমই 'এথেইজম', 'লিবারেলিজম' সহ অন্যান্য 'পক্ষ'কে নিজের করা শুরু করে আর জন্ম দেয় তথাকথিত আধুনিকতার।

সেকুলারিজমের স্বরূপ:

সেকুলারিজমের উদ্দেশ্য আসলে নিরপেক্ষতা হলেও এটি কখনোই নিরপেক্ষ কিছু নয়,বরং এটি একটি পক্ষ। একারণেই শরীয়াহর কথা বললে সেই পক্ষটিকে তেড়ে আসতে দেখা যায় তাদের মতবাদকে রক্ষা করতে।সেক্যুলারিজম কেবল একটা পক্ষই নয়, এটা একটা ধর্ম।

প্রথমতঃ ধর্মের সংজ্ঞা কী? ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস এবং কর্মের সমষ্টি। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং স্রষ্টা প্রণীত আইনে জীবন পরিচালনা করাই ধর্ম। সেক্যুলারিজমও একটা জীবনব্যবস্থা, এটার কিছু আইন আছে, নৈতিক নিয়মাবলী আছে, 'কী করা যাবে-কী করা যাবেনা' অর্থাৎ বিধিনিষেধের একটা সেট আছে, ধর্মেরই মতো।

প্রশ্ন আসতে পারে,সেক্যুলারিজমে স্রষ্টা কে? উত্তর হচ্ছে, সে নিজে। ফেরাউন যেমন স্রষ্টাকে অস্বীকার করে নিজেই স্রষ্টা বনে গিয়েছিলো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা ইন্ডিভিজুয়ালিজমে যেমন ব্যক্তি তার 'নফস' বা চাহিদাকে নিজের খোদা বানিয়ে ফেলে, সেক্যুলারিজমও তেমনি অন্য সব স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে নিজেকেই নিজে খোদা বানায় এবং কিছু নিয়ম জারি করে।

সেক্যুলারিজমের অনুসারীদের এসব নিয়ম মেনে চলতে হয়, সেটা তার ধর্মের বিরুদ্ধে গেলেও মানতে হয়, নয়তো সেক্যুলারিজম (সেক্যুলার স্টেট) তাকে শাস্তি দেয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির থেকে তার ঈশ্বরের আনুগত্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়। তার ঈশ্বরকে সরিয়ে

দিয়ে, ‘সেক্যুলারিজম’কে বসিয়ে দেয়া হয়। এগুলো আমার মুখের কথা নয়, ব্যবহারিক সেক্যুলারিজম অংশে আমার কথার পক্ষে আমি তথ্যপ্রমাণ দেবো।

ব্যবহারিক সেক্যুলারিজম

সেক্যুলারিজম নিরপেক্ষ নয়, এটি একটি পক্ষ। এমনকি এটি একটি ধর্ম। এর নিজস্ব আইনকানুন আছে, বিধিনিষেধ আছে। ধর্মীয় আইনের বিপক্ষে গেলেও সেক্যুলার আইন মানতে হবে। না মানলে বাধ্য করা হবে। অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারটি ভুয়া। স্কুলে কিশোর-কিশোরী একসাথে সাঁতার শেখা বাধ্যতামূলক ক্লাসে নিজেদের ১২ ও ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে তুর্কী বংশোদ্ভূত সুইস নাগরিক বাবা-মাকে প্রায় ষোল’শ পাউন্ড জরিমানা করে সুইজারল্যান্ডের স্কুল। তারা দাবি করে সাঁতার শেখা স্কুলের কারিকুলামের অংশ, তাই ক্লাসে না পাঠানোর এখতিয়ার অভিভাবকের নেই। ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা’ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই দম্পতি ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে মামলা করলে আদালত সুইস স্কুলের পক্ষেই রায় দেয়। ২০১৬ তে জার্মান আদালতেরও এক রায়ে বলা হয়, মুসলিম কিশোরীরা ছেলেদের সাথে সাঁতারের ক্লাস করতে বাধ্য। ২০১৬ তেই এক সুইস মুসলিম পরিবারকে ৫০০০ সুইস ফ্র্যাঙ্ক জরিমানা করা হয় তাদের ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী দুই ছেলে স্কুলের মহিলা শিক্ষিকার সাথে হাত মেলাতে রাজি হয়নি বলে। ইউরোপের ৭টি সহ মোট ১৩ টি দেশে নিক্কাব নিষিদ্ধ।

ক. ছেলেকে LGBT ক্লাস করতে না দেয়ায় বৃটেনে মুসলিম পিতাকে জেল। কয়দিন দিবে জরিমানা এই বাবা। থাকতে তো হবে (?) সেখানেই। (Dad who refuses to send son to school over LGBT lessons is facing jail)

খ. নিকাব নিষিদ্ধ করে দেশে দেশে আইন পাশ ও জরিমানার বিধান। (Which countries have a 'burqa ban'?)

জরিমানা গুণতে হবে (Denmark veil ban: First woman charged for wearing niqab)

গ. জার্মান কোর্ট হেডস্কার্ফ পরতেও বারণ করেছে। (Berlin court bars Muslim teacher from wearing headscarf)

ঘ. ইনসিওরেন্স ইত্যাদি সুদী ব্যবস্থার আওতায় সব নাগরিককে আসতে হয়।

ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘটনাগুলো সেক্যুলার স্টেটেই ঘটছে। সুইজারল্যান্ডের ঘটনাটিই খেয়াল করুন। ধর্মীয়ভাবে ছেলে- মেয়ের একসঙ্গে সাঁতার কাটা ইসলামে বৈধ নয়। কিন্তু সেক্যুলার স্টেট ইসলাম ধর্মে অবৈধ কাজটিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে বৈধ করেছে। এটা কি সরাসরি

তাদের মূলনীতিটির বিরোধী কাজ হলো না? নিক্বাবের স্বাধীনতা হরণ কিংবা হ্যান্ডশেক না করায় জরিমানা, এই সবই তো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। তবে কি সেক্যুলার আইন ইউটোপিয়ান? অর্থাৎ এর প্রকৃত বাস্তবায়ন নেই, ব্যাপারটা কি এমন? আসলে ব্যাপারটা এমন না। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার যেই মূলনীতিটি, আসলে সেটি সম্পূর্ণই 'লোক দেখানো'। এই মূলনীতি বাস্তবায়নের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। কেননা তারা তো আদতে নিরপেক্ষ নয়, তারা হচ্ছে একটা পক্ষ। অতীতের চার্চবিরোধী পক্ষ আজ 'ধর্মবিরোধী পক্ষ'। এটাই বাস্তবতা এবং এটাই সত্য। তারা অতীত ধর্মযুদ্ধ, রাষ্ট্র ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ইত্যাদির অভিজ্ঞতার বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করার থিওরির নাম দিয়েছে 'Secularism', ইংরেজীতে যার অর্থ দাঁড়ায় 'the belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc'. Secularism' টার্মটিকে পশ্চিমা বিশ্বের ডিকশনারিগুলোতে এভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেক্যুলারিজম বিষয়ে সবচেয়ে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, এটি রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক কী হবে সেই বিষয়ে একটি মতাদর্শগত কাঠামো প্রদান করে। এই প্রচলিত ধারণার অর্থ হচ্ছে যে সেক্যুলারিজম এমন সব প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে যেগুলো ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে সবার মতৈক্যের বাস্তবায়ন করবে এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ বজায় রাখবে। এই মতাদর্শিক কাঠামোর মধ্যে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, 'সেক্যুলার যুক্তির কারণে রাজনৈতিক জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়া উচিত'; 'ধর্মীয় যুক্তির ভিত্তিতে বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের সক্রিয় হওয়া উচিত নয়' এবং 'ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীর ততক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তাদের ধর্মীয় প্রত্যয় ত্যাগ করে সেক্যুলার বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে প্রস্তুত হচ্ছেন'।৩ সেক্যুলারিজমের একটি অন্যতম পুরোনো সংজ্ঞা থেকে পাওয়া যায় যা জর্জ জ্যাকব হোলিওক ১৮৫১ সালে তার বই দ্যা প্রিন্সিপালস অব সেকুলারিজম বইয়ে লিখেছেন, 'সেক্যুলারিজম হচ্ছে বস্তুবাদী উপায়ে মানবকল্যাণ বাড়ানো, উপযোগবাদী ধারায় মানবকল্যাণকে পরিমাপ করা এবং অন্যের সেবা করাকে জীবনের কর্তব্যে পরিণত করার জ্ঞান। সেক্যুলারিজম মানুষের বর্তমান অস্তিত্ব, এমন সব বিষয় এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত যেগুলোকে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা যায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের মুখ্য কর্তব্য হিসেবে মানুষের শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার উন্নয়ন বিধান করা; আস্তিকতা, নাস্তিকতা বা খ্রিষ্টধর্মের বাইরে প্রাকৃতিক নৈতিকতার ব্যবহারিক পর্যাপ্ততার বিষয়টি মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা।'

এরপর থেকে সংজ্ঞাটি পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এর সংজ্ঞাটিতে এখন আর কোনো অস্পষ্টতা নেই। শব্দটির বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও চার্লস টেইলর উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, ‘সেক্যুলারিজম দ্বারা কী বোঝায় তা [এখনো] সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট নয়’।৫ যেহেতু তিনটি ভিন্ন জ্ঞানের ধারায়, অর্থাৎ দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে— সেক্যুলারিজম পঠনপাঠন করা হয়, তাই এই ধারণার সঙ্গে তিনটি ভিন্ন ব্যাখ্যা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে। দার্শনিকভাবে এই বিষয়টিকে অতীন্দ্রিয়বাদ এবং অধিবিদ্যাকে বাতিল করে অস্তিত্ববাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের গ্রহণ হিসেবে দেখা হয়। সমাজতাত্ত্বিকভাবে এই ধারণা দিয়ে জনজীবন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ধর্মের প্রভাবের হ্রাস নির্দেশ করা হয়। রাজনৈতিকভাবে এটাকে ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) এবং জনপরিসরের (পাবলিক স্ফেয়ারের) পৃথক্করণ হিসেবে দেখা হয়, যা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক্করণ নির্দেশ করে। এগুলোই হচ্ছে সেক্যুলারিজম ধারণাটির সবচেয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যা।৬ এই ব্যাখ্যাগুলো একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন বলা যাবে না, বরং সবগুলো মিলিয়েই একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে সেক্যুলারিজমের পরিচিতি। যেকোনো রাজনৈতিক মতবাদ তৈরি হয় বিরাজমান ব্যবস্থা বা ধারণায় যখন অপূর্ণতা, অসংগতি বা ত্রুটি আছে বলে মনে করা হয়। সেক্যুলারিজম তার ব্যতিক্রম নয়। সেক্যুলারিজমের ধারণার উদ্ভবের ক্ষেত্রে ধর্মকে ওই অপর্যাপ্ততা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এই ধারণার উপর ভিক্তি করে যে কাজ করা হয় তা হলো সেকুলারকরণ। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিগত ও জনপরিসরের মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি করে এবং ধর্মকে ব্যক্তিপরিসরে সীমাবদ্ধ করে। সেক্যুলারকরণের মাধ্যমে সমাজে ধর্মের প্রভাবের ক্রমাগত হ্রাসকেও নির্দেশ করা হয়।

পিটার বার্গার সেক্যুলারকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি ‘সামাজিক জীবন এবং ব্যক্তিগত চেতনাবোধ উভয় ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকার সংকোচন ঘটায়’।

ইসলামের দৃষ্টিতে সেকুলারিজম:

সেকুলারিজম সাথে ইসলামের মৌলিক কিছু বিরোধ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো,এটি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত বিধান দেওয়ার বৈধতা দেয়। তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তথা ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইলাহ হিসাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে যা স্পষ্টভাবে কুফরী। বিধান প্রদানের মালিক হিসাবে অন্য কাউকে গ্রহণ করা। অথচ কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে -

مَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسۡمَآءً سَمَّیۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَاٰبَآؤُكُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۝

-তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছ। আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলীল নাযিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনিই এ হুকুম

দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। —ইউসুফ - ৪০। অধিকাংশ কাফির-মুশরিক পূর্ব অথবা আধুনিক সকলেই কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করেছে। কিন্তু সার্বিক জীবনে আল্লাহর বিধানসমূহ কবুল করলে সেটিকে বলা হয় তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ। তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর স্বীকারোক্তি ছাড়া শুধুমাত্র তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকারকারী ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ ই করতে পারেনা। যেমন মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে রব হিসেবে মানলেও তাদেরকে মুসলমান বলা হয়নি। তাদের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ই বলেছেন,

وَلَئِنۡ سَاَلۡتَہُمۡ مَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَسَخَّرَ الشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ لَیَقُوۡلُنَّ اللّٰہُ ۚ فَاَنّٰی یُؤۡفَکُوۡنَ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! তাহলে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে? (সূরা আনকাবূত-৬১)।

তাই মুসলমান হতে হলে ধর্মীয়,বৈষয়িক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্বকে মেনে নিতে হবে এবং সাধ্যমতো তার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করতে হবে। সেকুলারিজম কোনো মতেই তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ কে স্বীকার করেনা। এটি মানুষের উপরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে মানব রচিত আইন চাপিয়ে দেয়। গাইরুল্লাহকে রবের আসনে বসায়। ফলে মানুষ মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। অথচ মানুষ কেবল ই তার সত্য ইলাহ আল্লাহর দাসত্ব করবে, আল্লাহর বিধান মানবে,অন্য কারো বিধানকে স্বীকার করবেনা। যেসব শাসক আল্লাহর দীনকে পরিবর্তনের আদেশ দেয় সাথে সে স্থানে কুফরি আইন প্রতিস্থাপন করে এবং আল্লাহর বিধানের ওপর মানুষের বানানো বিধানকে প্রাধান্য দেয় তারা এসব কারণে মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাবে । সে বিশ্বাস করে,আল্লাহর আইনের চেয়ে মানুষের তৈরি আইন ই সমাজের জন্য উত্তম। এসব জঘন্য লোকের ব্যাপারেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ঘোষণা করছেন,

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡنَ یَزۡعُمُوۡنَ اَنَّہُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِکَ یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یَّتَحَاکَمُوۡۤا اِلَی الطَّاغُوۡتِ وَقَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ یَّکۡفُرُوۡا بِہٖ ؕ وَیُرِیۡدُ الشَّیۡطٰنُ اَنۡ یُّضِلَّہُمۡ ضَلٰلًۢا بَعِیۡدًا

-(হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে, তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তারা তাতেও ঈমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন (সুস্পষ্টভাবে) তাকে অস্বীকার করে।বস্তুত শয়তান তাদেরকে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়। (আন নিসা-৬০)

তাদের ইমান স্রেফ ধারণা ও মিথ্যা। তাদের ইমানের দাবি সত্য নয় কারণ ইমানের দাবি তো তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার (অর্থাৎ আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য সকল আইন) বিরোধী। বরং ইমানের হাকিকাত তো এটাই শেখায় যে,এসব আইনকে অস্বীকার করতে হবে,প্রত্যাখান করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যারা আল্লাহর দীনের বিপরীত বিধান তৈরি করে,আল্লাহর আইনকে তোয়াক্কা করেনা সে মূলত নতুন একটা দীন তৈরি করে। এর ফলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। যখন কেউ মানুষের জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ছেড়ে নতুন কোন বিধান তৈরি করে,সে নিজেকে সরাসরি আল্লাহর প্রভুত্বে শরীক করে,

اَمۡ لَہُمۡ شُرَکٰٓؤُا شَرَعُوۡا لَہُمۡ مِّنَ الدِّیۡنِ مَا لَمۡ یَاۡذَنۡۢ بِہِ اللّٰہُ ؕ وَلَوۡلَا کَلِمَۃُ الۡفَصۡلِ لَقُضِیَ بَیۡنَہُمۡ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِیۡنَ لَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۝

-তাদের কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দীন স্থির করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (আল্লাহর পক্ষ হতে) যদি মীমাংসাকর বাণী স্থিরীকৃত না থাকত তবে তাদের ব্যাপারটা চুকিয়েই দেওয়া হত। অবশ্যই জালেমদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।—আশ্-শূরা - ২১।

اِتَّخَذُوۡۤا اَحۡبَارَہُمۡ وَرُہۡبَانَہُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ وَالۡمَسِیۡحَ ابۡنَ مَرۡیَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡۤا اِلٰـہًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ؕ سُبۡحٰنَہٗ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ۝

-তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবার (অর্থাৎ ইয়াহুদী ধর্মগুরু) এবং রাহিব (খ্রিস্টান বৈরাগী)কে খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসীহ ইবনে মারয়ামকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করার হুকুম দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তাদের অংশীবাদীসুলভ কথাবার্তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। —আত তাওবাহ্ - ৩১। রসূল ﷺ তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রুবুবিয়্যাতের কর্তৃত্ব দেওয়ার ব্যাখায় বলেছেন যে, তাদের ধর্মগুরুগণ হালাল বিধানকে হারাম করত এবং হারাম বিধানকে হালাল করে দিত। আদী ইবনু হাতিম রদ্বিয়াল্লহু আনহু গলায় ক্রুশ ঝুলানো অবস্থায় রসূল ﷺ এর কাছে আসলে রসূল ﷺ এটাকে ছুড়ে ফেলতে বলার হাদীসে এসেছে তিনি রসূল ﷺ কে বললেন— আমরা তো আমাদের ধর্মগুরুদের ইবাদাত করতাম না। তখন নবী ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু তারা তোমাদের জন্য আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম আর আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল বলে ঘোষণা করলে তোমরা কি সেগুলো মেনে নাওনি?'তখন তিনি বললেন—হ্যাঁ, নিয়েছিলাম।নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটাই তো তাদের ইবাদাত করা। [সুনানুত তিরমিযি:৩০৯৫]

যারা নিজেদের বিচার-ফায়সালার ভার গাইরুল্লাহর প্রতি অর্পণ করে তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমান ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লহ) বলেন,

'' আল্লাহ তার নবীর উপর যে বিধান নাযিল করেছেন,তা দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা যে ব্যক্তি আবশ্যক মনে করবেনা অবশ্যই সে কাফির।পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠী ও মতবাদ সবাই কিছু না কিছু ন্যায়- ইনসাফ ও কল্যাণের কথা বলে।তাদের ধর্মে ন্যায়-ইনসাফ সেটাই হয়, যেটা তাদের ধর্মগুরুরা মনে করে। অসংখ্য লোক রয়েছে,যারা ইসলামের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ঠিকই, কিন্তু বিচার-ফায়সালা করে নিজেদের স্বভাব-ফায়সালা অনুযায়ী– যেভাবে আল্লাহ শাসনের অনুমতি দেননি।যেমন বেদুইনদের প্রাচীন উপাখ্যান,যা দিয়ে তারা শাসন কাজ চালাত।তারা বিশ্বাস করত, কুরআন সুন্নাহ ছাড়া যা ইচ্ছা তা দিয়ে শাসনকাজ চালানো যায়।এটাই কুফর।বিপুল পরিমাণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঠিকই,কিন্তু তারা নিজেদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের প্রাচীন রীতি-রেওয়াজ দিয়েই শাসনকাজ পরিচালনা করত। তারা যদি এ কথা বোঝার পরও আল্লাহর নীতিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা দিয়েই শাসন করাকে হালাল মনে করে,তবে অবশ্যই তারা কাফির। [মিনহাজুস সুন্নাহ:৫/১৩০]

শহিদ আবদুল কাদির আল-আওদাহ (রহিমাহুল্লহ) যিনি খুব কাছে থেকে মানবরচিত আইনব্যবস্থা দেখেছেন তিনি বলেন,

'' কোনো মুসলিম কখনোই আল্লাহর কাছে মুসলিম বলে গণ্য হবেনা, যতক্ষণ না সে নিজের সব পরিস্থিতিতে ইসলামকেই ফায়সালা দানকারী নির্বাচন করবে এবং পারস্পরিক দ্বন্দে ইসলামকেই সমাধানের মাপকাঠি নির্ধারণ করবে। যেন সে আল্লাহর এই বাণীকে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করতে পারে,

فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ حَتّٰی یُحَکِّمُوۡکَ فِیۡمَا شَجَرَ بَیۡنَہُمۡ ثُمَّ لَا یَجِدُوۡا فِیۡۤ اَنۡفُسِہِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیۡتَ وَیُسَلِّمُوۡا تَسۡلِیۡمًا

–না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে। —আন নিসা - ৬৫।

আল্লাহপ্রদত্ত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা না করে শরীয়াহবিরোধী শাসনব্যবস্থার দ্বারস্থ ব্যক্তি কাফির হওয়া প্রসঙ্গে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَمَنۡ لَّمۡ یَحۡکُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡکٰفِرُوۡنَ ۞

–যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, তারাই কাফির। [সূরা মায়িদাহ:৪৪]

এই ইসলামি শাসনবিধানকে সেকুলারিজমসহ বিভিন্ন প্রকার মতবাদ,শাসনরীতি দ্বারা অপসারণ করে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে। ইসলামের সাথে এসব মতবাদের সম্পর্ক কতটুকু তা বুঝতে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই তা পরিষ্কার হবে। আর কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলা যাবে,এসব মানব-রচিত মতবাদ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা

মুসলিমদের প্রতিনিয়ত কুফরের দিকে প্ররোচিত করছে এবং সেদিকে ক্রমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। **সেকুলারিজম একটি কুফরি মতবাদ** হওয়ার জন্য সেকুলারিজমের সংজ্ঞা বুঝাই যথেষ্ট। আমরা জানি সেকুলারিজম মানে ধর্মের সাথে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই এবং এসবের সাথে ধর্মেরও কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন দিয়ে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবনে টেনে আনা যাবেনা। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ইসলাম অনুযায়ী হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আর কোনো ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ-তার জীবন ধর্মের আওতামুক্ত। মানব জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে- রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক,কি ব্যক্তি জীবনে- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কুফরি বলে মনে করতে হবে।দীন ইসলামে এর কোনো সুযোগ নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্র: ব্যক্তিগত, সামাজিক,রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন- সর্বত্র অবশ্যই আল্লহ প্রদত্ত দীন ও শরীয়াহ পরিচালকের আসনে আসতে হবে। মানবজীবনের সর্বত্র একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ ইসলামি শরীয়াহ। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এ প্রসঙ্গে বলেন,

ثُمَّ جَعَلۡنٰکَ عَلٰی شَرِیۡعَۃٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ فَاتَّبِعۡہَا وَلَا تَتَّبِعۡ اَہۡوَآءَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর রেখেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ কর এবং যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। —আল জাছিয়াহ - ১৮। যারা সেকুলারিজমের সমর্থক,প্রচারক,এর জন্য লড়াই করে তারা সবাই কুফরে আকবারে লিপ্ত কারণ তারা আল্লাহর দীনের বিপরীতে নতুন একটি মতবাদকে বেছে নিয়েছে।

শরীয়াহ প্রত্যাখান:

فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ حَتّٰی یُحَکِّمُوۡکَ فِیۡمَا شَجَرَ بَیۡنَہُمۡ ثُمَّ لَا یَجِدُوۡا فِیۡۤ اَنۡفُسِہِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیۡتَ وَیُسَلِّمُوۡا تَسۡلِیۡمًا

–না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে।

—আন নিসা - ৬৫

এই আয়াতের সারমর্ম হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের বক্তব্যের বিপরীতে অন্য কারও কথা চলবে না। উসুলুল ফিকহের যত কিদাবাদি রয়েছে,প্রত্যেকটির প্রথম পাতা মহান ইমাম ও উসুলবিদদের এই কথার উপর ইজমা উল্লেখের মাধ্যমে করা হয়–

"أجمع المسلمون على أن الله هو الحكيم وحده"
"পুরো মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত,সবকিছুর ফায়সালাদানকারী একমাত্র আল্লাহ "।
এ কথাটিই কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন অকাট্য আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে,
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ
''বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহর ই।'(ইউসুফ-৪০)
এ আয়াতটি এমন একটি শব্দে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তা আল আযীয একক সত্তার হাতে সব বিচারব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট করে ফেলেছে। সূরা ইউসুফে দুবার এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লহ বলেন,
'' সমস্ত মুসলিম একমত পোষণ করেছে যে, কারও সামনে নবী ﷺ এর সুন্নাহ স্পষ্ট ও প্রকাশিত হলে তার জন্য সেই সুন্নাহ ছেড়ে অন্য কারও মতামত গ্রহণ করা বৈধ নয়।[ইমাম ইবনুল কায়্যিম,ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন:২/৩২৫]
সন্তুষ্টচিত্তে বা আনুগত্যপূর্বক মানবরচিত মতবাদের কাছে বিচার- ফায়সালা ন্যাস্ত করা মানেই নিজের ঘাড় থেকে ইসলামের শেকল ছুড়ে ফেলা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ছেড়ে অন্যের কথা ও নির্দেশকে বিচারের মানদণ্ড মেনে সন্তুষ্ট থাকবে বা কুরআন-সুন্নাহর ওপর মানুষের মতবাদকে অগ্রগণ্য মনে করবে, ইসলামে তার কোনো অংশ থাকবে না।এটা স্বয়ং কুফর। আর এতে কোনো অস্বচ্ছতা,সংশয় ও অস্পষ্টতাও নেই।আল্লাহই বিধানদাতা আর তার কিতান তার বিধানের তত্ত্বাবধায়ক।কুরআন-সুন্নাহর উপর ছড়ি ঘোরানোর অধিকার কোনো মানুষের নেই। মানুষের দায়িত্ব তো কেবল এর ওপর আমল করা, বাস্তবায়ন করা।
كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ
(শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দীনের অনুসারী ছিল। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন, (সত্যপন্থীদের জন্য) সুসংবাদদাতা ও (মিথ্যাশ্রয়ীদের জন্য) ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। আর তাদের সাথে সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করলেন, যাতে তা মানুষের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল।[সূরা বাকারাহ-২১৩]।
উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবাইর (রাঃ) এক আনসারীর সঙ্গে ঝগড়া করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে যুবাইর! জমিতে পানি সেচের পর তা ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এ কথা শুনে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে যুবাইর! পানি বাঁধে পৌঁছা পর্যন্ত সেচ দিতে থাক। তারপর বন্ধ করে দাও। যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছেঃ ''তোমার রবের কসম, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার উপর অর্পণ না করে''- (আন-নিসা ৬৫)।

আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার অর্পণ করা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। কাযি আবু ইয়ালা আল-হাম্বলি (রহিমাহুল্লহ) বলেন,

‘তাগূতের কাছে বিচার-ফায়সালার ভার ন্যাস্ত করা কুফরির নামান্তর। নবী ﷺ এর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট না থাকা কুফরি।এটা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত।

প্রথম দলিল:

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ

তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন (সুস্পষ্টভাবে) তাকে অস্বীকার করে। (সূরা নিসা-৬০)

এখানে তাগূতের কাছে বিচার-ফায়সালার ভার ন্যাস্তকরণকে প্রতি ইমান আনা ধরা হয়েছে।আর নি:সন্দেহে তাগূতের প্রতি ইমান আনার মানেই আল্লাহর প্রতি ইমান হারিয়ে ফেলা,আল্লহকে প্রত্যাখান করা। ঠিক যেমন আল্লাহর প্রতি ইমান আনার মানেই তাগূতকে প্রত্যাখান করা।

দ্বিতীয় দলিল:

فَلَا وَرَبِّکَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوۡکَ فِيۡمَا شَجَرَ بَيۡنَہُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُوۡا فِيۡۤ اَنۡفُسِہِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُوۡا تَسۡلِيۡمًا

–না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে।—আন নিসা - ৬৫।

যে ব্যক্তি নবী ﷺ বিচারের প্রতি সন্তুষ্ট হয়না,এটা সেই ব্যক্তির কুফরির ব্যপারে সুস্পষ্ট দলিল।

তৃতীয় দলিল:

فَلۡيَحۡذَرِ الَّذِيۡنَ يُخَالِفُوۡنَ عَنۡ اَمۡرِہٖۤ اَنۡ تُصِيۡبَہُمۡ فِتۡنَۃٌ اَوۡ يُصِيۡبَہُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ

সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত। না জানি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে। (সূরা নূর-৬৩)।

এই আয়াত স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করা মারাত্মক অপরাধ।

কাসিমি (রহিমাহুল্লহ) বলেন,

‘‘কিছু কিছু মুফাসসির এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন,আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি তুষ্ট থাকা এবং তিনি যা বিধিবদ্ধ করেছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব।এই আয়াত এও

বলে,ইসলামি শরীয়াহ ত্যাগ করে অন্য কোনো ব্যবস্থার কাছে নিজেদের বিচার ন্যাস্ত করা বৈধ নয়।” [জামালুদ্দিন আল -কাসিমি,মাহসিনুত তাওয়িল,খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:১১৫]

রসূলুল্লহ ﷺ কে ফায়সালাদানকারী মনোনীত করা এবং তার ব্যক্তিসত্তাকে বিচারব্যবস্থার স্বত্বাধিকারী মেনে নেওয়ার অর্থই হলো তার আনীত শরীয়াহ ও মানহাজকে সব ফায়সালার জন্য মনোনীত করা। তা না হলে নবী ﷺ মৃত্যুর পর আল্লাহর শরীয়াহ ও তার রাসূল এর সুন্নাহর কোনো স্থানই থাকবেনা। যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য না করার কারণে এবং মৃত্যুর পরে রসুলুল্লাহ ﷺ বিচার-ফায়সালাকে গ্রহণ না-করার কারণে যুদ্ধ করেছেন।অতএব,কোনো ব্যক্তির ইসলাম প্রমাণ করতে হলে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর শরীয়াহ ও নবীর নির্দেশের কাছে সব বিচার-ফায়সালা ন্যাস্তকরণ যথেষ্ট হলেও কারও ইমান প্রমাণ করার জন্য শুধু এতটুকু যথেষ্ট হবেনা, বরং এর জন্য প্রশান্তির সাথে অন্তরের তুষ্টি,হৃদয়ের স্বীকৃতি এবং অন্তরের আত্মসমর্পণ থাকতে হবে।এটিই ইসলাম।এটিই ইমান।

যারা আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়াহর প্রতি সব আইন ও নিয়মনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করবেনা,অথবা আল্লাহর বিধান ও ব্যবস্থা পাশ কাটিয়ে অন্য মতবাদ ও ব্যবস্থার প্রতি ঝুকবে কিংবা আল্লাহর বিধানের সাথে মানুষের তৈরি ও প্রবৃত্তির অনুগামী মতবাদ,আচার-প্রথাকে সংযুক্ত করবে,এমনকি ভিন্ন অনুশাসন দিয়ে আল্লাহর বিধান অপসারণের সমর্থন দিবে তারা এই দীনের সীমা থেকে ছিটকে পড়বে।

وَاِنۡ اَطَعۡتُمُوۡہُمۡ اِنَّکُمۡ لَمُشۡرِکُوۡنَ ۠

যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে। —আল আনআম - ১২১।

اَفَحُکۡمَ الۡجَاہِلِیَّۃِ یَبۡغُوۡنَ ؕ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰہِ حُکۡمًا لِّقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ ۠

তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফায়সালা চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়সালা দানকারী কে হতে পারে?—আল মায়িদাহ - ৫০।

জাহেলিয়াত শব্দটি ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলাম হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানের পথ। কারণ, ইসলামের পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ নিজেই। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। অপরদিকে ইসলামের বাইরের যে কোন পথই জাহেলিয়াতের পথ। আরবের ইসলামপূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সে যুগে জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা, কল্পনা, আন্দাজ, অনুমান বা মানসিক কামনা-বাসনার ভিত্তিতে মানুষেরা নিজেদের জন্য জীবনের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। যেখানেই যে যুগেই মানুষেরা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে, তাকে অবশ্যই জাহেলিয়াতের কর্মপদ্ধতি বলা হবে।

মোটকথা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত বিধান প্রদান করাই জাহিলিয়াত। [সা’দী] হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে তিনজন। যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মধ্যে অন্যায় কাজ করে, যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্বেও জাহেলী যুগের রীতি-নীতি অনুসন্ধান করে এবং যে ব্যক্তি কোন অধিকার ব্যতীত কারো রক্তপাত দাবী করে। [বুখারীঃ ৬৮৮২] হাসান বসরী বলেন, যে কেউ আল্লাহর দেয়া বিধানের বিপরীত বিধান প্রদান করল সে জাহিলিয়াতের বিধান দিল। [ইবন আবি হাতিম, ইবন কাসীর]

এই আয়াতের ব্যাখায় উসতায আহমাদ শাকির রহিমাহুল্লহ বলেন,

''এই নতুন ধর্মকে লুফে নেওয়া কি কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ হবে?ছেলে-মেয়েকে এই নতুন ধর্মটি শিখতে, এর চিন্তাবিশ্বাসকে গ্রহণ করতে এবং এর কার্যকর ও প্রায়োগিক দিক আয়ত্ত করতে পাঠানো কি কোনো বাবার জন্য বৈধ হবে,চাই সে জেনেশুনে পাঠাক বা না-জেনেই? কোনো মুসলিমের জন্য কি অনুমতি আছে এই নব্য রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচারক পদে বসার?না,এই অবস্থায় কোনো মুসলিমের জন্য বিচারবিভাগের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বাতিল।কোনোভাবেই সেটা শুদ্ধ হবার সুযোগ ই নেই। মানবরচিত এই নব্য মতবাদ ও বিচারকাঠামোর সবদিক সূর্যের মতো সুস্পষ্ট। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত কুফরি,এর মাঝে কোনো অস্পষ্টতা নেই।যে-ই হোক না কেন,এই ব্যবস্থার জন্য কাজ করা বা তার সামনে নত হওয়া কিংবা এর স্বীকৃতি দেবার ওযর কোনো মুসলিমেরই চলবেনা। অতএব,প্রত্যেক ব্যক্তির সতর্ক ও সজাগ থাকা উচিত।প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাফসের হিসাবগ্রহণকারী। [উমাদুত তাফসির:৪/৪৭]

শরীয়াহ ই মানবজীবনের জন্য উত্তম জীবনব্যবস্থা:

শরীয়াহর শাব্দিক অর্থ শরীয়াহ আরবী শব্দ,এর আভিধানিক অর্থ জীবন পদ্ধতি,জীবন আচার,ধর্ম,নিয়ম নীতি ইত্যাদি।তবে আরবী ভাষায় শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হলো -পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে। শরীয়াহ হলো যা বান্দাহর জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাআলা লিপিবদ্ধ করেছেন।শরীয়াহ হল জীবন বিধান।যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

لِكُلٍّ جَعَلۡنَا مِنۡكُمۡ شِرۡعَۃً وَّ مِنۡهَاجًا

-তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীয়াহ ও স্পষ্ট পন্থা। (মায়িদা:৪৮)

শরীয়াহর পারিভাষিক অর্থ: মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দার জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য যে আকিদা,ইবাদাত,আখলাক,লেনদেন ও জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন,যা তাদের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি বাস্তবায়ন করে তা-ই হল ইসলামি শরীয়াহ।

সকল জীবনব্যবস্থার চাইতে শরীয়াহ উত্তম বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরীয়াহর বৈশিষ্ট্যগুলোই যথেষ্ট।

তার মধ্যে শরীয়াহর মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি আল্লাহর প্রদত্ত জীবন-বিধান।এতে যা কিছু আছে সব ই আল্লাহর নিকট হতে। **দ্বিতীয়ত** এটি ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ ও স্বার্থ বাস্তবায়ন করে।কেননা ইসলামি শরীয়াহ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যিনি আলীম,হাকীম সেহেতু এটি মানবজাতির শান্তি বাস্তবায়ন করে যখন তারা এ অনুযায়ী জীবন যাপন করবে।কারণ এটি মানব জীবন পরিচালনার সব নিয়মকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। **তৃতীয়ত,** ইসলামি শরীয়াহ বিশ্বব্যাপী ও সার্বজনীন। জমিনে যে স্থানে ও যে কালেই মানুষ পাওয়া যাবে ইসলামী শরীয়াহ তাদের ব্যক্তিগত,সামাজিক,রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা এটা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে। **চতুর্থত,**ইসলামি শরীয়াহ মানুষের অন্তরকে লালন-পালন করে। ইসলামি শরীয়াহর আহকাম আক্বিদার সাথে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও ইসলাম মুসলমানের অন্তরে ভয়-ভীতির বীজ বপন করে। যা মুসলিমকে বল প্রয়োগ বা জোর ছাড়াই আল্লাহর বিধানসমূহ সন্তুষ্টচিত্তে ও নিজের পছন্দে মানতে সাহায্য করে।কেননা সে এ কথা উপলব্ধি করে যে ইসলামি আইন মানা হচ্ছে দীন ও আল্লাহর আনুগত্য পোষণ। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন মানতে মানুষ জালিয়াতি ও ছল চাতুড়ির আশ্রয় নেয়। তারা মনে করেন যে এ আইন মেনে চলা কোনো আনুগত্য নয় এবং এর থেকে ভেগে যাওয়া কোনো দোষ নয়। ইসলাম থেকে বিচ্যুত সমাজে যা কিছু ঘটছে এবং তাদের আইন কানুন সমাজে শান্তি,নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও অপরাধ দমনে ব্যর্থতাই প্রমাণ করে ইসলামি শরীয়াহ বাস্তবায়ন কতটা প্রয়োজন।আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যথার্থই বলেছেন,

وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُکۡمًا لِّقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ ﴿۵۰﴾

-খাটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লহর চেয়ে কে উত্তম? (আল মায়িদা-৫০)

পঞ্চমত, ইসলামি শরীয়াহ সমতার ভিক্তিতে প্রতিষ্ঠিত।মানব রচিত আইন মানুষের মাঝে সমতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়না।ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতে কর্তব্য,অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে সবাই সমান।শাসক ও জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

فَمَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّۃٍ خَیۡرًا یَّرَہٗ ؕ﴿۷﴾وَ مَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّۃٍ شَرًّا یَّرَہٗ ﴿۸﴾

সুতরাং, কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলেও সে তা দেখবে।এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে।(সূরা যিলযাল:৭-৮)

ষষ্ঠত ইসলামি শরীয়াহ সহজ-সরল জীবন-পদ্ধতি।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

২:২৮৬لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَ عَلَيۡهَا مَا اكۡتَسَبَتۡ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِيۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَاۤ اِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ

-আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। তার কল্যাণ হবে সে কাজেই যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং তার ক্ষতিও হবে সে কাজেই, যা সে স্বেচ্ছায় করে। (হে মুসলিমগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে এই দু'আ কর যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যদি কোনও ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তবে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি সেই রকমের দায়িত্বভার অর্পণ করো না, যেমন তা অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার চাপিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।(সূরা বাকারা-২৮৬)

আল্লাহ তার দয়া ও অনুগ্রহের কারণে আমাদের উপর এমন কোনো যা পালন করা আমাদের জন্য কষ্টকর,যেমনভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের উপর তাদের নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা ও কাপড় বা শরীরের কোনো স্থানে অপবিত্র লাগলে সে স্থান কেটে ফেলার ইত্যাদি কষ্টকর দায়িত্ব দিয়েছেন।বরং তিনি আমাদের জন্য সহজ করেছেন, আমাদের উপর থেকে বোঝা সরিয়ে দিয়েছেন যা তিনি পূর্ববর্তীদের সীমালঙ্ঘনের কারণে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

يُرِيۡدُ اللّٰهُ بِكُمُ الۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيۡدُ بِكُمُ الۡعُسۡرَ ۫

আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না। —আল বাকারা - ১৮৫।

ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ مِنۡ حَرَجٍ ؕ

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।—আল হাজ্ব - ৭৮। এই বাণীর অর্থ তোমাদের সাধ্যের বাইরে তিনি কোনো বিধান আরোপ করেননি,তোমাদের উত্তরণের পথ ব্যাতীত তিনি কোনো কষ্টকর আদেশ তোমাদের জন্য অত্যাবশকীয় করেননি।[তাফসীর ইবনে কাসীর:৩/২৩৬]

রসূল ﷺ এর একটি হাদীস দ্বারাও দীনের সহজতার কথা স্পষ্ট হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِهَا

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হত, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহ না হত। গুনাহ হতে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিশোধ নিতেন।' (বুখারী-৩৫৬০)।

শরীয়াহর সৌন্দর্য:শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত সমাজ নিরাপদ। এ সমাজের প্রতিটি মানুষই মান-সম্মানের দিক দিয়ে নিরাপদ থাকে। যেমন,ব্যাভিচার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ।কোনো বিবাহিত লোক ব্যাভিচার করলে পাথরের আঘাতে মৃত্যশাস্তি ভোগ করার উপযুক্ত হয়ে যায়।এ সমাজের কোনো ব্যক্তি সামান্য শব্দ থেকেও নিরাপদ থাকে। চাই তার সম্মানে ছোট্ট একটি অপবাদমূলক শব্দ হোক।এই ছোট্ট একটা অপমাদমূলক শব্দ অপবাদদাতার উপর জনসম্মুখে আশিটি বেত্রাঘাত আবশ্যক করবে। কোনো দূষিত শব্দে কারো মান-মর্যাদা কলুষিত হবেনা।

একজন মুসলিম তার সম্পদের ব্যাপারেও নিরাপদ। চুরি কবিরা গুনাহ।যে এক দিনারের এক চতুর্থাংশ সমপরিমাণ অর্থ চুরি করবে,তার হাত কেটে দেওয়া হবে।রাসূল ﷺ বলেছেন,

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.

এক দ্বীনারের চার ভাগের এক ভাগ চুরি করলে হাত কাটা হবে।(বুখারী:৬৭৯০)।

এমনকি একজন মুসলিম নিজ অর্থ-সম্পদ অন্যায় ও অবৈধ পথে নষ্ট করে ফেলা থেকেও নিরাপদ।সুদ হারাম করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র গুদামজাত করে রাখাও অবৈধ।প্রতারণা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ।আর জুয়া নাপাক।এ তো শয়তানের কাজ।

একজন মুসলিম নিজ প্রাণের ব্যাপারেও নিরাপদ।যে হাত অন্যায়ভাবে কারও রক্ত প্রবাহিত করতে প্রসারিত হয়,আর নিহতের পরিবার ও আত্মীয়রা হত্যাকারী থেকে কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে,তাহলে এই হাত কখনোই বাকি থাকবেনা (অর্থাৎ এর কিসাস নেওয়া হবে)। এটিই সর্বসম্মত মাসয়ালা।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

এবং আমি তাতে তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান ও দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমেও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে ব্যক্তি তা (অর্থাৎ বদল) ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা (গুনাহের) কাফফারা হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালিম।—আল মায়িদাহ - ৪৫। একজন মুসলিমের জান,ধন-সম্পদ, সম্ভ্রম সবকিছু শাসকের কাছ থেকেও নিরাপদ।শাসক-শাসিত সবাই শরয়ী বিধানের অধীন।কেউ ই শরীয়াতের বাইরে বের হওয়ার ক্ষমতা রাখেনা।

এ সমাজের সব সদস্য এক দেহের মতো।যদি এই শরীরের কোনো অঙ্গ জ্বরাক্রান্ত হয়,তো গোটা শরীরই জ্বর ও অনিদ্রা অনুভব করে। ইসলামি সমাজ পরিচ্ছন্ন সমাজ।সেখানে এমন

কোনো ফেনা(ময়লা-আবর্জনা) নেই,যা এই সমাজের উপর ভেসে থাকতে পারে।এমন কোনো পঙ্কিলতা ও জটিলতাও নেই,যা এই সমাজের স্বচ্ছতাকে কর্দমাক্ত করতে পারে। এ সমাজ হয় অভাবমুক্ত সমাজ।উমার ইবনু আবদুল আযীযের শাসনামলে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আফ্রিকা অঞ্চলের যাকাত সংগ্রহ করে দীর্ঘ এক মাস যাবৎ ঘোষণাই দিতে থাকেন,যেন যাকাতের হকদাররা এসে নিজেদের প্রাপ্য নিয়ে যায়।কিন্তু কেউ ই এলোনা।অবশেষে খলিফাহ এগুলো দিয়ে দাস-দাসী কিনে আযাদ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।এ সমাজ পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দে পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ সমাজ,যেখানে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি,সূক্ষ্ম কোনো ফাঁকফোকরও নেই। এই সমাজে ফাটল ধরানোসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার সামর্থ্য কোনো বহিরাগত দলের নেই। এ এমন এক ঐক্যবদ্ধ সমাজব্যবস্থা, যার প্রতিটি সদস্যের হৃদয় এক ও অভিন্ন থাকে।তারা আমিরের আদেশের প্রতি যত্নবান।তারা আমিরের দিক-নির্দেশনায় চলাফেরা করেন।

মানবজীবনে শরীয়াহর প্রয়োজনীয়তা :কোনো সুদৃঢ় বিশ্বাস না মেনে দীনের বাধন থেকে মুক্ত হতে চেয়ে মানবজাতি চরিত্র,দীন,চিন্তা এবং সব রেওয়াজ-প্রথার সংস্কারের ডাকে সাড়া দিয়ে কোন কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে তা যেসব দেশ বস্তুগত সম্পদের প্রাচুর্যে ভাসছে তাদের দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায়।একদিকে তাদের অর্থনীতি আকশচুম্বী ঠিকই,কিন্তু অন্যদিকে সম্পদ বন্টনে অবিচারের ফলে দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব। একদিকে বিলাসিতা,অন্যদিকে দরিদ্রদের ভিতরে প্রতিহিংসার ক্রোধ। তাদের সমাজব্যবস্থা ধাপে ধাপে ভেঙে পড়ছে।সমাজব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।দমন,খুন ও ভীতির এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে তাদের পথঘাট পরিণত হয়েছিল কসাইখানায়। ক্রমাগত আত্মিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় তাদের বস্তুতান্ত্রিক জীবনকে প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত করেছে।এছাড়া মানবজাতি যেসব দুরবস্থার শিকার হয়,মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যেসব দিকে প্রবাহিত হয়,জলে-স্থলে নিজেদের কৃতকর্মের ফলে যে ফাসাদের সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র যে দু:খ-দুর্দশা মানুষের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে,এসব কিছুর কারণ একটিই—মানুষের সৌভাগ্যের জন্য,কল্যাণের জন্য যে মৌলিক নীতিমালা দেওয়া হয়েছিল,তা থেকে বের হয়ে যাওয়া। কিতাবুল্লাহর কাছে সব বিচার-ফায়সালা ন্যাস্ত করার মৌলিক নীতি ভুলে যাওয়া। সব বিষয়ের চাবিকাঠি এর মূল ও মালিক আল্লাহর কাছে হস্তান্তর না করা।

لَهٗ مَقَالِيۡدُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ۚ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কুঞ্জি তাঁরই হাতে। —আশ্-শূরা - ১২

মানবজাতি যে দু:খ-কষ্টের মোকাবেলা করছে,যেসব রোগে আক্রান্ত হয়েছে,এসব কিছুর একমাত্র সমাধান মহান আল্লাহর এই কিতাবের মধ্যেই রয়েছে।কিতাবুল্লাহর কাছে সমস্ত

বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়,বরং এরই নাম ইমান।আল্লাহর শরীয়াহর কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করা ইমান ও ইসলামের কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই।এর অনুপস্থিতি মানেই ইসলামের অনুপস্থিতি।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না।কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল। —আল আহ্‌যাব - ৩৬

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা অনুগত হয়েছি। অতঃপর তাদের একটি দল এরপরও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়। —আন নূর - ৪৭

মানুষের ফিতরাহর অংশ যেসব নৈতিক মূল্যবোধ আছে

যেমন:সততা,সত্যবাদিতা,বিশ্বস্ততা,সচ্চরিত্র,সতীত্বের মতো মূল্যবোধগুলো,বিয়ে,পরিবার,মা ও স্ত্রী হিসেবে নারীর ভূমিকা সব ধরনের সমাজে অত্যন্ত গুরুত্ব ও সম্মানের সাথে দেখা হয়। নৈতিকতার মাপকাঠিকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে সেক্যুলারিজম সেখানে বসায় মানবীয় খেয়ালখুশিকে।সেক্যুলারিজম নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে মানুষের খেয়ালখুশিকে,সেই খেয়ালখুশি হতে পারে একজন স্বৈরশাসকের,গুটিকয়েক নেতার অথবা সংখ্যাগুরুর।

"তুমি কি তাকে দেখনি,যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে?তবুও কি তুমি তার জিম্মাদার হবে?"(সূরা আল ফুরক্বন-৪৩)

মানুষের খেয়ালখুশি ও কামনা-বাসনা প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে।এর কোনো স্থিতিশীলতা নেই।তাই এগুলোর ভিক্তিতে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ,নৈতিকতা এবং আদর্শও বদলাতে থাকে ক্রমাগত।সমাজে সেক্যুলারিজমের প্রসারের সাথে সাথে কমতে থাকে ফিতরাহগত মূল্যবোধ,কমতে থাকে তাদের প্রভাব।ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে পুরো সমাজ ঐ অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে।

ইসলামী শরীয়াহর সৌন্দর্য হলো শরীয়াহ মানুষের ফিতরাহ বা সহজাত প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর খেয়ালখুশিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা সেকুলার ব্যবস্থা ফিতরাহর সাথে সাংঘর্ষিক।একটির কেন্দ্রে আছে মানুষ আর আরেকটির কেন্দ্রে তাওহীদ ও রিসালাত।মানবজাতির আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা সমাধান

দেয় শরীয়াহ।কারণ শরীয়াহ মানুষের জন্য এমন একটি বাহ্যিক পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ নৈতিকতার মানদণ্ড ঠিক করে দেয়,যা নিয়ন্ত্রণে রাখে মানুষের নাফস ও কুপ্রবৃত্তিকে।
যে শরীয়াহ এসেছে মহান রব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে সেই শরীয়াহকে দূরে ঠেলে দিয়ে সেক্যুলারজম কিংবা কোনো মানব রচিত মতবাদ গ্রহণে মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তি সুদূর পরাহত। শরীয়াহ ই একমাত্র কল্যাণ ও মুক্তির পথ হওয়ার কারণ হিসেবে এটি বোঝাই যথেষ্ট যে,এটি আসমানি বিধান।বাকি সকল বিধান পরিত্যাজ্য।
সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার প্রেরিত রসূল ﷺ এর উপর।

الحمدلله رب العالمين،اللهم صلى على محمد،و على ال محمد....